সংবাদ পরিষেবা | অগস্ট ২০২৩

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

## বাড়ছে প্রাকৃতিক চাষ

২৯/১০

মোট ৮টি রাজ্যে প্রায় ৪.০৯ লক্ষ হেক্টর জমি প্রাকৃতিক চাষের আওতায় এসেছে বলে কৃষিমন্ত্রক জানিয়েছে। এই ৮টি রাজ্য হল, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কেরালা, ওড়িশা, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং তামিলনাড়ু। কেন্দ্র ২০১৯-২০ সাল থেকে পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার অধীনে ভারতীয় প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি নামে একটি উপ-যোজনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক চাষের প্রচার করছে।

এই রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমি প্রাকৃতিক চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও, মধ্যপ্রদেশে ৯৯ হাজার, ছত্তিশগড়ে ৮৫ হাজার, কেরালায় ৮৪ হাজার, ওড়িশায় ২৪ হাজার, হিমাচলে ১২ হাজার, ঝাড়খণ্ডে ৩ হাজার ৪০০ এবং তামিলনাড়ুতে ২ হাজার হেক্টর জমিতে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষ হচ্ছে।

রাসায়নিক মুক্ত এই প্রাকৃতিক চাষ হচ্ছে স্থানীয় সম্পদ, কৃষি, পশুপালন, ফসলের অবশিষ্টাংশ, গবাদি পশুর মল ও মূত্র এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন জমি ঢেকে রাখা ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে।

## কৃষিতে নারী

২৯/১১

কৃষি নিয়ে নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে নারী কৃষকদের ক্ষমতায়ন শস্য বৈচিত্র বাড়াতে পারে। আর বৈচিত্রময় এবং স্বাস্থ্যকর শস্যগুলি সারা বছর ধরেই উৎপাদন হতে পারে। দ্য ল্যানসেট প্ল্যানেটরি হেলথ জার্নালে প্রকাশিত এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, নারীদের কৃষি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকলে, খামার, জমি এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলির উপর মালিকানা অধিকার থাকলে, তারা পুষ্টিকর ফসল চাষে বেশি আগ্রহী হয়।

গবেষণায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদনে মাটির উর্বরতা বাড়ে। রোগপোকার আক্রমণ কমে। ফলে পরিবেশও ভালো থাকে। বিভিন্ন ফসল দ্রুত পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চাষ করা যায়। এতে বাজারেও নানা ধরনের খাবারের জোগানও বাড়ে।

সারা বিশ্বে অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক। এইসব চাষি পরিবারের মহিলারা চাষে সবথেকে বেশি সময় দেয়। কিন্তু জমির মালিকানা তাদের থাকে না। এমনকী চাষের সিদ্ধান্ত তাদের পরামর্শ ছাড়াই নেওয়া হয়।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল নারীর ক্ষমতায়ন এবং শস্য বৈচিত্রের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে দেখতে— বুরকিনা ফাসো, ভারত, মালাউই এবং তানজানিয়ায় এই সমীক্ষা করেছিল।

## চাষির ফসলে দাম নেই

২৯/১২

প্রচুর জলের চাহিদা সম্পন্ন ধান-গম চাষের চক্র ভাঙতে হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব সরকার ভুট্টা, তুলো, সূর্যমুখী এবং মুগ জাতীয় ফসলের চাষকে উৎসাহিত করছে। কিন্তু এসব ফসলের সঠিক দাম না পাওয়ায়, সরকারের শস্য বহুমুখীকরণের এই পরিকল্পনা সফল হচ্ছে না। এ নিয়ে রাজ্য দুটির চাষিরা সূর্যমুখীর বীজের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (বা এমএসপি) কুইন্টাল প্রতি ৬৪০০ টাকা করার জন্য আন্দোলনও করছে। খোলা বাজারে প্রতি কুইন্টাল এই বীজের দাম ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা ।

একইভাবে, মুগের সহায়ক মূল্য প্রতি কুইন্টাল ৭,৭৫৫ টাকা হলেও, চাষিরা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন ৬ হাজার টাকা দরে। চাষিদের কথা অনুযায়ী, পাঞ্জাবে ভুট্টার দাম সহায়ক মূল্যের থেকে ১ হাজার টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে। ২০২২-২৩ সালের বিপণন মরশুমের জন্য কুইন্টাল প্রতি ভুট্টার দাম ধার্য হয়েছে ১,৯৬২ টাকা। হরিয়ানায়ও দাম এমএসপি'র থেকে ৫০ শতাংশের নীচে নেমে গেছে এবং কৃষকরা প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

পাঞ্জাবে গম ও ধানের আওতাধীন মোট জমি যথাক্রমে ৩৫ লাখ এবং ৩০ লাখ হেক্টর। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য ফসলের কম দাম পাওয়ায়, নিশ্চিত দামের জন্য বেশিরভাগ চাষিরা গম এবং ধানই চাষ করে। কৃষি নীতি বিশেষজ্ঞ দেবিন্দর শর্মা বলেছেন, কৃষকরা ধান ফলানো লাভজনক বলে মনে করে। তাই এর এলাকা বাড়ছে। শস্য বহুমুখীকরণের প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত কাজ করেনি। তিনি আরো বলেন, আমরা যদি আমাদের মাটির নীচের জল এবং বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করতে চাই, তাহলে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমাদের চাষ করতে হবে। এজন্য যেসব কৃষক ধান, গম ছেড়ে বৈচিত্রময় ফসল চাষ করবে, তাদের জন্য সরকারকে সব রকম সাহায্য করতে হবে। কারণ এই চাষ ভবিষ্যতের জন্য। সরকারের উচিত এ নিয়ে এখনই একটি পাইলট প্রকল্প শুরু করা।

## কৃষিতে যন্ত্রণার যন্ত্রায়ন

২৯/১৩

ইদানিং বড় বড় হার্ভেস্টর মেশিন দিয়ে ধান কাটার পর জমিতে লম্বা নাড়া পড়ে থাকে। ফলে পরের চাষে অসুবিধা হয়। তাই গত ১০-১২ বছর ধরে চাষিরা এই নাড়া জমিতেই পুড়িয়ে দেয়। হাত দিয়ে ধান কাটার সময় নাড়ার উচ্চতা খুবই কম রাখা হত। পরের চাষে জমি চষার সময় কোনো সমস্যা হত না। খড়ও নানা কাজে ব্যবহার হত। এখন নাড়া পোড়ানোর জন্য প্রচুর বায়ু দূষণ হয়। সম্প্রতি এ রাজ্যেও জমিতে নাড়া পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এজন্য শুধু বায়ু দূষণ নয়, জমিতে থাকা অসংখ্য অণুজীব মারা পড়ছে। জমির উর্বরতাও কমছে।

অক্টোবর এবং নভেম্বরে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশে নাড়া পোড়ানোর জন্য রাজ্যগুলিতে এমনকী দিল্লি শহরেও বায়ু দূষণ খুবই বেড়ে যায়। মানুষের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিতে হয় দূষণের জন্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি এবং পরিবেশমন্ত্রক পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে নাড়া পোড়ানো একেবারে বন্ধ করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য চারটি রাজ্যকে ক্রপ রেসিডিউ ম্যানেজমেন্ট (সিআরএম) প্রকল্পের অধীনে পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করছে। এর থেকে নাড়া তোলার মেশিন, ডিকম্পোজার ইত্যাদি ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে। জমি থেকে দূরে বাণিজ্যিকভাবে ধানের খড় থেকে বিদ্যুৎ, জৈব সার তৈরি এবং তার ব্যবহারের দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

হার্ভেস্টর মেশিন আগে ব্যবহার হত না। শ্রমের খরচ কমানোর জন্য এর ব্যবহার শুরু হয় খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে। কিন্তু এর জন্য যা দূষণ শুরু হয়েছে বা যেভাবে মাটির উর্বরতা কমছে তা ভয়াবহ। এসব বুঝে আবার মেশিন ব্যবহার করে দূষণ কমানোর কথা বলা হচ্ছে। কৃষির যন্ত্রায়ন এইভাবেই বাড়ছে। চাষ চলে যাচ্ছে কোম্পানিদের হাতে। অথচ দেশজ প্রক্রিয়ায় যে চাষ হয় তাতে মেশিনের রমরমা থাকে না। কৃষিজ বর্জ্য খুব ভালভাবেই ব্যবহার হয়। দূষণ ছড়ায় না। গ্রামেই শ্রমের মাধ্যমে লোকেদের কাজ মেলে। তবে আমাদের নীতিকারেরা, ছোটখাট 'সমস্যা' এড়াতে, যে নিদান দিচ্ছেন তা বড় বিপদ ডেকে আনছে। যারা এইসব যান্ত্রিক ব্যবস্থা এনে কৃষিকে শিল্পে পরিণত করতে চাইছেন - তারা কী একটু ভেবে দেখবেন ?

## শিশু মৃত্যুর কারণ

২৯/১৪

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (এনএফএইচএস) বা জাতীয় পরিবারভিত্তিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা -৪ এ, ৫ বছরের কম বয়সী মৃত্যুর হার ছিল ৪৯.৭। এনএফএইচএস সমীক্ষা - ৫ এ, যেটা ২০১৯ থেকে ২০২১ এর মধ্যে হয়েছিল, তাতে এই মৃত্যুর হার কমে হয়েছে ৪১.৯ শতাংশ।

২০১৭-১৯ সালের মধ্যে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনার অফিস কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণগুলি হল— নির্দিষ্ট সময়ের আগে শিশুর মৃত্যু এবং জন্মের সময় প্রয়োজনের তুলনায় কম ওজন (৩১.২ শতাংশ), নিউমোনিয়া (১৭.৫ শতাংশ), জন্মগত শ্বাসকষ্ট এবং জন্মগত আঘাত (৯.৯ শতাংশ), সংক্রামক নয় এমন রোগ (৯.৬ শতাংশ), ডায়ারিয়া জাতীয় রোগ (৫.৮ শতাংশ), জন্মগত অসঙ্গতি (৫.৭ শতাংশ), আঘাত (৪.৯ শতাংশ) ভুল এবং অজানা কারণ (৪.৩ শতাংশ), অজানা জ্বর (৪.১ শতাংশ), তীব্র ব্যাকটেরিয়াল সেপসিস এবং গুরুতর সংক্রমণ (৩.৮ শতাংশ) এবং অন্যান্য আরো সব কারণ (৩.৩ শতাংশ)।

## প্লাস্টিকময়

২৯/১৫

২০২৩-এর ২৮ জুলাই পৃথিবী তার প্রথম প্লাস্টিক ওভারশুট ডে দেখেছে। এই ওভারশুট ডে মানে কি? মানে হল, সারা বছর পৃথিবীর যতটা প্লাস্টিক ধারণ এবং ফের ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে তা ৭ মাসেই পূরণ হয়ে গেছে। সুইজারল্যান্ডের আর্থ অ্যাকশন নামে একটি সংস্থা এই পরিমাপ করে। তাদের মতে এই বছর প্রায় ৬৮,৬৪২,৯৯৯ টন অতিরিক্ত প্লাস্টিক বর্জ্য প্রকৃতিতে পাওয়া যাবে। দেশে দেশে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা বাড়লেও, ২০৪০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক উৎপাদন বাড়বে এবং এর দূষণ তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে আর্থ অ্যাকশনের প্রতিবেদনে। তাদের মতে, ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টন প্লাস্টিকের মধ্যে, একক বা অল্প সময়ের জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পরিমাণ হবে ৬৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন যা মূলত দূষণের কারণ হবে।

ব্যক্তি প্রতি প্লাস্টিক ব্যবহারে সব থেকে এগিয়ে আছে আইসল্যান্ড, যার বার্ষিক ব্যবহার ১২৮.৯ কেজি। ভারতে এর পরিমাণ ৫.৩ কেজি। পৃথিবীতে বছরে গড়ে ব্যক্তি প্রতি ২০.৯ কেজি প্লাস্টিক ব্যবহার হয়। একটি দেশের প্লাস্টিক ওভারশুট ডে'র পরিমাণ করা হয় মিসম্যানেজড ওয়েস্ট ইনডেক্স বা বর্জ্য অ-ব্যবস্থাপনা সূচকের উপর ভিত্তি করে। মাথা পিছু অনেক কম প্লাস্টিক ব্যবহার হলেও, ভারতে ব্যবহৃত প্লাস্টিক বর্জ্যের ৯৮.৫৫ শতাংশের কোনো ব্যবস্থাপনা করা হয় না। তাই এই তালিকার চার নম্বরে আমরা রয়েছি। আমাদের আগে যে তিনটি দেশ রয়েছে সেগুলি হল মোজাম্বিক (৯৯.৮ শতাংশ) নাইজেরিয়া (৯৯.৪৪ শতাংশ) এবং কেনিয়া (৯৮.৯ শতাংশ)।

আর্থ অ্যাকশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৩ সালে ভারতে অব্যবস্থাপিত প্লাস্টিক বর্জ্য হতে পারে ৭৩ লক্ষ ৭৫২ টন। এর মধ্যে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৬৪ টন মাইক্রো-প্লাস্টিক নদী নালা, সমুদ্রে মিশবে— যেটা বিপজ্জনক।

## কমিশনের আওতায় চিকিৎসা

২৯/১৬

কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় মেডিকেল কমিশন আইন ২০১৯-এর আওতায় চিকিৎসা ব্যবস্থার মান নির্ধারণের জন্য একটি পর্ষদ গঠন করেছে। ভারতীয় মেডিকেল পরিষদ আইন ১৯৫৬-এর আওতায় মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রক আইন ২০০২ চালু হয়েছিল। চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা সম্পর্কে যেসব অভিযোগ আসে, তার মোকাবিলার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ডাইরেক্টরেট এবং রাজ্যের চিকিৎসা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তবে অভিযোগকারী যদি রাজ্যের গৃহীত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে জাতীয় মেডিকেল কমিশনে আবেদন করতে পারে।

নির্দিষ্ট মানের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রদানের জন্য, ব্যয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য লিখে রাখার বিষয় বেসরকারি হাসপাতালগুলির জন্য ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কমিশনের নিয়ম না মানলে হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার সংস্থানও রয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবহেলা সংক্রান্ত অভিযোগ এখন জেলা বা রাজ্য স্তরে আবেদন করা যেত। এখন থেকে অভিযোগ জাতীয় স্তরেও দায়ের করা যাবে বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সংসদে জানিয়েছে।

## অন্য মণিপুর

২৯/১৭

মণিপুরের চান্দেল জেলার খুরিংমুল গ্রামের তাবিথা, মণিপুরের তারো বা তারাও উপজাতির একজন নারী। তাবিথা একজন দক্ষ কারিগর এবং উদ্যোক্তা যিনি দারুণ সব বাঁশের সামগ্রী তৈরি করেন। ঝুড়ি, মাদুর ইত্যাদি থেকে আয় তার পরিবারের জীবিকার প্রধান উৎস। তার দুটি ছোট ছেলে আছে যারা স্কুলে পড়ে এবং তার স্বামী রাজমিস্ত্রির কাজ করে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে এই শিল্পকর্ম শিখেছিলেন তাবিথা। আগে তিনি এইসব সামগ্রী তৈরি করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতেন। তার কাজ দেখে আগ্রহী হয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইনের (এনআইডি) বিশেষজ্ঞরা। তাদের সাহায্যে তিনি তাঁর তৈরি সামগ্রী যেমন ফার, রুওপোক, বুককাং, লুকপাক, লুইটন এবং পিশেপের মতো সব ঐতিহ্যবাহী মণিপুরি পণ্য নতুন রূপে তৈরি করতে শুরু করেন। এনআইডি তাঁর তৈরি সামগ্রীগুলি রাজ্যের বাইরে বিক্রির জন্যও সহায়তা করে।

২০১৭ সালে তাঁর গ্রামে ৩৫ জন মহিলার সঙ্গে মিলে তিনি একটি সমবায় তৈরি করেন। ওদের সবাইকে তাবিথা এবং এনআইডি সামগ্রীগুলি নতুন ডিজাইন করতে সাহায্য করে। তারো ভারতের সব থেকে ছোট উপজাতি সম্প্রদায়। এরা বহুদিন আগে বার্মা থেকে এসে মণিপুরে বসবাস করতে শুরু করে। এদের বাঁশের তৈরি সামগ্রীগুলি এখন দিল্লি, কর্নাটকের মহীশূর, উত্তর কেরালা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে বিক্রি হয়। বর্তমানে এই কারিগরেরা মাসে গড়ে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা আয় করে।

এখন বড় বিক্রেতারা তাদের থেকে পণ্যগুলি নেয় এবং প্রায় ৫ গুণ বেশি দামে বিক্রি করে। তাবিথা এবং তাদের সমবায় সরাসরি ক্রেতাদের বিক্রি করার জন্য নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করছে। তারা মনে করে, সামগ্রীগুলি সরাসরি বিক্রি করতে পারলে তাদের আয় ৩-৪ গুণ বাড়বে।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু